

GED 01 বাংলা ভাষা

১. দ্রবণি পরিবর্তনের কারণ ও সূত্রাবলী আলোচনা কর। ✓
২. ন-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান এর নিয়মাবলী আলোচনা কর। ✓
৩. ভাষায় আগত উল্লেখ পূর্বক সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য আলোচনা কর।
৪. ছেদচিহ্নের ব্যবহার দেখাও। ✓
৫. প্রমিত বাংলা একাডেমির ১২টি বাংলা বানানের নিয়ম দেখাও।
৬. ভাষার গুরুত্ব দাও। মানব জীবনে ভাষার গুরুত্ব আলোচনা কর।
৭. বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা কর।
৮. যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক পদে একটি আবেদন লেখ। ✓
৯. বাংলা ভাষায় তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তজ্জব দেশি, বিদেশি শব্দের ব্যবহার দেখাও।
১০. বাগধারার ব্যবহার দেখাও। ✓

প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম আলোচনা কর।

উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত বাংলা বানানের নিয়ম বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। আধুনিক যুগের সূচনার তথা বাংলা সাহিত্যিক গদ্দের উন্মেশকালে মোটামুটি সংস্কৃত বানানের অনুশাসন অনুসারে বাংলা বানান নির্ধারিত হয়। কিন্তু বাংলা ভাষার বহু তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ থাকলেও অধি-তৎসম, দেশি, বিদেশি শব্দের পরিমাণ কম নয়। এছাড়া রয়েছে তৎসম-অতৎসম প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ-ইত্যাদি সহযোগে গঠিত নানা রকমের মিশ্র শব্দ। তার ফলে বানান নির্ধারিত হলেও বাংলা বানানের সমতাবিধান সম্ভবপর হয়নি। তাই বাংলা বানানের অসুবিধা ও অসঙ্গতি দূর করার জন্য প্রথমে বিশ শতকের বিশের দশকে বিশ্বভারতী এবং পরে ত্রিশের দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম নির্ধারণ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রসহ অধিকাংশ পণ্ডিত ও লেখক সমর্থন করেন। এখন পর্যন্ত এই নিয়মই আদর্শ নিয়মরূপে মোটামুটি অনুসৃত হচ্ছে। ১৯৫৫ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চৰ্চা গবেষণা ও প্রচারের লক্ষ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাংলা বানানের জন্য বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের রীতি অনুসরণ করা হয়।

বানান বলতে আমরা বুঝি শব্দস্থিত বর্ণসমূহের ক্রমিক বর্ণন। যেমন: কলম। আবার অন্যভাবে বলা যায় শব্দের বর্ণ বিশ্লেষণ বা বর্ণের লিখন পদ্ধতিকে বানান বলে। এক কথায় শব্দ লেখার সঠিক নিয়মকে বানান বলে।

প্রমিত শব্দের অর্থ একটি মানে উন্নীত করা হয়েছে এমন। সর্বজনগ্রাহ্য তথা মানসম্মত বাংলা বানানের রূপকেই প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম বলে।

প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মাবলি আলোচনা করা হলো।

১. যেসব তৎসম শব্দে ই ও বা উ উভয় শব্দ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন তিনি হবে। যেমন: কিংবদন্তি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, নাড়ি, পদবি, পল্লি, ভঙ্গি, যুবতি, রচনাবলি, শ্রেণি, সূচিপত্র।

২. রেফের পর ব্যঙ্গনবর্ণের দ্বিতীয় হবে না। যেমন: অর্জন, কার্তিক, সূর্য, কর্ম ইত্যাদির পরিবর্তে যথাক্রমে অর্জন, কার্তিক, সূর্য, কর্ম-ইত্যাদি।

৩. সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ম স্থানে অনুস্থার (ংং) হবে।

যেমন: অহঘ-কার = অহংকার

সন্ধিবদ্ধ না হলে ম স্থানে ংং হবে না। যেমন: অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঞ্চা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম।

৪. শব্দের শেষে বিসর্গ (ংং) থাকবে না। যেমন: ইতন্ত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, ফলত, মূলত। এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জিত রূপে গৃহীত হবে। যেমন: দুষ্ট, নিষ্ঠক, নিষ্পৃহ, নিশ্বাস।

৫. সকল তৎসম অর্থাৎ তত্ত্ব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কারচিহ্ন তিনি ব্যবহৃত হবে।

যেমন: আরবি, আসামি, ইংরেজি, ইমান, ইরানি, উনিশ, চাচি, জমিদারি।

৬. পদাশ্রিত নির্দেশিত টি-তে ই-কার হবে। যেমন: ছেলেটি, বইটি, লোকটি।

৭. শব্দের শেষে প্রসাঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্মার (ংং) ব্যবহৃত হবে। যেমন: গাং, ঢং, পালং, রং, রাং, সং। তবে অনুস্মারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হলে নও হবে। যেমন: বাঙালি, ভাঙা, রঙিন। বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে অনুস্মার থাকবে।

৮. বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে ষ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন: কিশমিশ, নাশতা, পোষাক, শয়তান, শরম, শরবত, শাটৰ।

৯. ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি S ধ্বনির জন্য স এবং- sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। যেমন:

Passport পাসপোর্ট

Cash ক্যাশ

Television টেলিভিশন

Mission মিশন

Station স্টেশন

১০. বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বণবিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন: স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং।

তবে অন্য ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন: মার্কস, শেকসপিয়র, ইসরাফিল।

১১. হস-চিহ্ন (্ঠ) যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন: কলকল, জজ, ডিশ, তছনছ। তবে যদি অর্থবিভাস্তির বা ভুল উচ্চারণ আশঙ্কা থাকলে হস-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন: উহু, বাহু, যাহু।

১২. উধূ ক্যাম যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন: বলে (বলিয়ে), হয়ে, আল (আইল)।

১৩. সমাসবদ্ধ শব্দগুলি একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন: নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র, সংবাদপত্র, রবিবার, মঙ্গলবার।

১৪. বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন: ভালো দিন, লাল গোলাপ, সুগন্ধ ফুল, সুনীল আকাশ।

বাগধারা বলতে কী বোঝা? বাগধারার প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

সাহিত্যের নানা অঙ্গের মধ্যে বাগধারা এক বিশেষ অঙ্গ। সব সাহিত্যেই বাগধারাগুলি বিশেষ ভঙ্গিমায়, বিশেষ ধারায় প্রবাহিত হয়ে ভাষাকে ব্যঙ্গনাময় করে তোলে। বিশেষ বিশেষ মূহূর্ত এর প্রয়োগ ভাষায় যেমন সুষমা আনে, তেমনি আনে অর্থবহুতা। নানা উপর্যুক্ত, উপদেশ, রস সংক্ষণ, সমস্যার সরলীকরণ বা ব্যাখ্যান বাগধারাগুলির দ্বারা সাধিত হয়। এর নিজস্ব গতিময়তা আছে, উচ্চারণভঙ্গী আছে এবং নির্দিষ্ট প্রয়োগ ক্ষেত্র। যথাস্থানে, যথাসময়ে এবং যথার্থভাবে প্রয়োগ করলে বাগধারার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

বাগধারা, প্রবাদ, প্রবচন, এদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র, সংজ্ঞা থাকলেও সাহিত্যে এরা প্রায় একাকার। ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ যেটি প্রবাদ বা প্রবচন সেটিই সুন্দরভাবে কোথাও বাগধারা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাগধারার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানই হলো এর প্রয়োগ পদ্ধতি এবং কথাটি বিশেষ ক্ষণে বিশেষ ভঙ্গীতে উপস্থাপিত করা।

লোকের মুখে মুখে যে বাগধারাগুলির সংঘার সেগুলির একত্রিত করে লিপিবদ্ধ করার কৃতিত্ব তিনজন ব্যক্তির। দুইজন ইংরেজ এবং একজন বাঙালি। উইলিয়ম মর্টন, রেভারেন্ড জেমস লঙ্গ এবং ড. সুশীলকুমার দে। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় কয়েক

বাগধারা শব্দের অর্থ কথা বলার বিশেষ ঢং বা রীতি। এটা এক ধরনের গভীর ভাব ও অর্থবোধক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ। বাগধারার সাহায্যে নতুন এবং বিশেষ ধরনের অর্থবোধক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ গঠিত হয়। ইংরেজিতে এদেরকে ইডিয়ম (Idiom) বলে।

বাগধারা ব্যবহারের ক্ষেত্র বা বাগধারার প্রয়োজনীয়তা বাগধারা মূলত কথ্য ভাষার সম্পদ হলেও তা এখন আর কেবল কথ্য ভাষায় সীমাবদ্ধ নেই। সাহিত্যে তার বিচরণ এখন যততত্ত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কারণ, যতই দিন যাচ্ছে ততই মানুষ তার ভাষাকে আরো বেশি প্রকাশযোগ্য করার নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মনের ভাবকে অল্প কথায় আরো সুন্দর ও যথাযথভাবে প্রকাশ করার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে বাগধারা। বাগধারার প্রয়োগ বক্তব্যকে অধিকতর তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলে। বাগধারা ভাষার সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, অর্থে স্পষ্টতা এবং ভাবে ব্যঙ্গন আনে, বক্তব্য আকর্ষণীয় করে কথায় শুভিমাধুর্য দান করে। তাই ভাষায় বাগধারা ব্যবহারের গুরুত্ব অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

অকাল কুশাগ্র (আদুরে অকর্মণ্য ব্যক্তি)- কুশাগ্র অর্থ চালকুমড়া। কুশাগ্রের নৃন্যতম কাল পূর্ণ না হলে অর্থাৎ বোঁটার দিকে চুন বা খাগি না পড়লে তা খাবার যোগ্য হয় না এবং পূজার বলিতেও দেওয়া হয় না। সেই অর্থে অকাল কুশাগ্র ব্যবহারের অযোগ্য বস্তু। দ্বিতীয় অর্থে- কুশাগ্র বর্ষা ও শরতের ফসল। কিন্তু কখনো কখনো হেমন্তের শিশির পড়া আরম্ভ হলে পুরনো

গাছে পাশলতা বেরিয়ে তাতে কুম্ভাও ফতে দেখা যায়। একপ কুম্ভাওকেও অকাল কুম্ভাও বলা হয়। তাই বুড়ো বয়সের সন্তানকে অকাল কুম্ভাও বলে। এরকম সন্তান আদুরে নিষ্কর্ম।

অকূল পাথারে পড়া (আসহায় অবস্থায় সহায় পাওয়া)- পাথার অর্থ সমুদ্র। কুলহীন সমুদ্রে পড়লে সাহায্যের কেউ থাকে না।
অবস্থাটি খুব সংকটজনক।

অক্ষা পাওয়া (মারা যাওয়া)- অক্ষা শব্দটি দেশি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ জ্যেষ্ঠ ভগিনী, বয়স্কা নারী। মরণের সাথে কোনো সম্বন্ধ নেই। তবে বৈশ্বিক জগতে যেমন মরণকে কৃষপ্রাণির সাথে তুলনা করা হয় তেমনি হয়তো শাক্ত জগতে মরণকে অক্ষা অর্থাৎ বয়স্কা নারী অর্থাৎ মা কেপাওয়ার সাথে এক করে দেখা হয়।

অক্ষরে অক্ষরে (অবিকৃতভাবে)- লিখিত বা মৌখিক যে নির্দেশই থাকে না কেন তার কোনোরূপে পরিবর্তন, সংক্ষার, সংযোজন বা বিয়োজন না করা। যা লিখিত আছে তার প্রতিটি অক্ষর অবিকৃত রাখা।

আকাশ কুসুম (অলীক কল্পনা/অবাস্তব বন্ধ)- বাস্তবে আকাশে কোনো ফুল ফোটে না। তাই আকাশ কুসুম কল্পনা সৃষ্টি। এর কোন অন্তিম নেই।

আকাশ থেকে পড়া (বিস্মিত হওয়ার ভাব করা)- আকাশ থেকে পৃথিবীতে কেউ পড়লে পৃথিবীর সম্বন্ধে তার জ্ঞান থাকে না। কেননা পৃথিবী তার কাছে নতুন ঘায়গা।

আকাশ ভেঙে পড়া (হঠাতে সমুহ বিপদে পড়া)- বাড়, জল অশনি সম্পাত এসব একসাথে ঘটলে তাকে আকাশ ভেঙে পড়া বলে। আকাশ ভেঙে পড়া অর্থ প্রলয়ের লক্ষণ। সারা আকাশ ভেঙে পড়লে মানুষ সরে দাঁড়ানোর ঘায়গা পায় না।

আদাজল খেয়ে লাগা (দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করা)- আদাজল অগ্নিবর্ধক। আহারে রুচিকর এবং ফলত হজমে সহায়তা করে বলবর্ধক করে। নতুন বলে বলীয়ান হয়ে কাজে নামাকে আদাজল খেয়ে লাগা বলে।

ইচড়ে পাকা (অল্প বয়সে পাকামি)- কচি কাঁঠালকে ইচড় বলে। এর দ্বারা তরকারি রান্না করা হয়। ইচড় কোনো কারণে পাকলে তা দিয়ে তরকারি রান্না হয় না। আবার পাকা কাঁঠালের মতো তার স্বাদগন্ধও থাকে না। তেমনি অপরিণতবুদ্ধিসম্পন্ন বালক যদি বৃক্ষের মতো কথাবার্তা বলে বা আচরণ করে সেইটাও গ্রহণীয় হয় না, বরং নিন্দনীয়।

খোদার খাসি (বিনা পরিশ্রমে নিশ্চিন্ত জীবনধারী)- ঈশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত খাসি যত্রত্র ঘুরে বেড়ায়। পরের বাগানের শাক সবজি খায়। পাপের ভয়ে মানুষ তার অনিষ্ট করে না।

গড়লিকা প্রবাহ (অঙ্গভাবে পূর্বজনকে অনুসরণ করা)- গড়ল এর অর্থ গাড়ল বা ভেড়া। শ্রী লিঙ্গে গড়লিকা বা গড়লিকা। ভেড়ার পালের ভেড়িগুলো আগে আগে যায়, ভেড়াগুলো তাদেরকে অঙ্গভাবে অনুসরণ করে চলে।

গরিবের ঘোড়া রোগ (যার যেমন তার তেমন না হওয়া)- পূর্বে ঘোড়া ছিল যানবাহনের অন্যতম। রাজারা বা আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তিরা ঘোড়া কিনে প্রয়োজনের সময় দূর-দুরান্তে যাতায়াত করতেন। পরবর্তীকালে ঘোড়ায় চেপে যাতায়াত ধীনীদের মধ্যে একটি শখ হয়ে দাঁড়ায়। ঘোড়া পোষা ব্যবস্থা জেনেও কোনো কোনো গরিবের মধ্যেও এই শখ সংক্রমিক হয়।

ঘর পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায় (গুর্বে একবার যার বিপদের অভিজ্ঞতা হয়েছে পরে সেই বিপদের চিহ্নমাত্র দেখলেই সে শক্তি হয়)- আগুন লেগে গোয়ালঘর পোড়ার সময় যে গোরুটি পুড়েছিল সে দেখেছিল তার মাথার উপর আকাশ ছিল লাল। পরবর্তীকালে আকাশ লাল হলেই তার আশঙ্কা হয় ফের বুঝি গোয়ালে আগুন লেগেছে।

ঘোড়ার ডিম (অবাত্তব বস্ত)- ঘোড়া স্তন্যপায়ী প্রাণী, ডিম পাড়ে না। ঘোড়ার ডিম অস্তিত্বহীন।

চালে তেঁতুল (পরম্পর বৈরিতা)- ভাতের হাঁড়ি বসিয়ে চাল দেওয়ার পর যদি তাতে খানিক তেঁতুল দেওয়া হয় তাহলে হাঁড়ির চাল আর সিঁজ হবে না। চালগুলো শক্ত হয়ে থাকবে।

ছিনে জোঁক (নাছোড়বান্দা)- এক প্রকার শীর্ণ জোঁক যা কামড়ালে ছাড়তে চায় না।

ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে (অপরের কৃতিত্বকে নিজের বলে চালানো)- কেরামত এসেছে আরবি কারামত থেকে। যার অর্থ অলৌকিক শক্তি, বুজুর্নি। এক ফকির গ্রামবাসী শিষ্যদের কাছে নিজের অলৌকিক শক্তি আলোচনা করেছিলেন। ঠিক সেই সময়ে এক প্রচণ্ড বড় ওঠে এবং একটি কাকের মৃত্যু হয়। ফকির সাহেব দাবি করেন যে তাঁর অলৌকিক শক্তির বলে কাকের মৃত্যু হয়েছে। গ্রামবাসীও এই কেরামতি দেখে সন্তুষ্ট।

টাকার কুমির (ধনশালী লোক)- কিংবদন্তি আছে কুমির সঞ্চায়ী প্রাণী। শিকার ধরামাত্র সবটা খেয়ে ফেলে না। সঞ্চয় করে পুঁতে রাখে, পচায় আর খায়। সেই অর্থে সঞ্চয় করে যে ধনশালী হয়েছে সে টাকার কুমির।

করেঙ্গে ইয়া মরেঙে (হয় করব, নয় মরব)- কথাটি ইংরেজি Do or die- এর হিন্দি তর্জমা। ১৯৪২ সালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় গান্ধিজির ভারত ছাড়ো প্রস্তাব কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক কমিটিতে গৃহীত হ'লে গান্ধিজি দৃঢ় কঠে করেঙ্গে ইয়া মরেঙে এই কথাটি ঘোষণা করেন। তারপর থেকে যে কোনো কঠিন কাজের শপথ গ্রহণকালে এই কথাগুলি উচ্চারিত হয়। এবং বর্তমানে বাংলা বাগধারাতেও ব্যবহৃত হয়।

কাঁটার মুকুট (কর্তা হওয়ার অস্তিত্ব)- আগের যুগে রাজা রানিরা মুকুট পরতেন। এখনো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পুরক্ষার স্বরূপ মুকুট প্রদান করা হয়। মুকুট শ্রেষ্ঠত্ব সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক। কিন্তু মাঝে মাঝে দেখা যায় মুকুট যিনি পরেন তাঁর দায়িত্বে, দায়িত্ব, কর্তব্য ইত্যাদি এত বেশি হয় যে মুকুটটাই তাঁর শিরো বেদনার কারণ হয়ে ওঠে।

কাঁঠালের আমসত্ত্ব (অসম্ভব ব্যাপার)- পাকা আমের রসকে শুকিয়ে আমসত্ত্ব তৈরি করা হয়। কাঁঠালের রসকে শুকিয়ে কাঁঠালসত্ত্ব তৈরি করা যেতে পারে। কিন্তু কাঁঠালের রসে আমসত্ত্ব তৈরী করা যায় না। ব্যাপারটি অসম্ভব।

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন (নামের সাথে শুণের মিল না থাকা বা যার যে শুণ নেই তাকে সেই শুণ আরোপ করা)- পদ্মের ফুলের পাপড়ির মতো সুন্দর চোখের গড়ন যার সেই পদ্মলোচন। যার চোখ কানা তার নাম যদি পদ্মলোচন হয় তাহলে সেটা হাস্যাম্পদ হয়ে দাঁড়ায়।

কারো পৌষ্মাস, কারো সর্বনাশ (একজনের কাছে যা সুখ, অন্যের কাছে তা দুঃখের কারণ হতে পারে)- পৌষ্মাস সুখের মাস, ঘরে ফসল তোলার সময়। ধনীদের ঘরে অশন ও বসনের প্রাচুর্য। আবার এই সময়ে গরিব দুঃখীদের বস্ত্রাভাবে শীতে কষ্ট।

কুকুরের পেটে যি সহ্য হয় না (প্রকৃত কারণে সবার সব জিনিস সহ্য হয় না)- জনশ্রুতি আছে কুকুর যি খেলে তার সব লোম উঠে যায়। তখন তাকে নেড়ি কুস্তা বলে।

কৈ মাছের প্রাণ (শীষ্ট যার প্রগান্ত ঘটে না)- কৈ মাছের দুটো শাসমন্ত্র থাকায় তারা জলে স্থলে নিঃশ্বাস নিতে পারে। ফলে তারা স্থলেও অনেকক্ষণ বাঁচে, অন্য মাছের মতো সহজে মরে না।

খুদে শয়তান (দুরত্ব ছেলে)- খুদে অর্থ স্ফুর্দ, ছোট। শয়তান অর্থ হচ্ছে পাপের উপদেবতা। তার তেকে প্রচলিত অর্থ দুর্বৃত্ত, বদমাইশ ইত্যাদি। তাই বয়ক দুর্বৃত্তকে শয়তান এবং দুরত্ব বাচাকে খুদে শয়তান বলা হয়। কোনো কোনো মা আদর করেও দুরত্ব ছেলেকে খুদে শয়তান বলে ডাকে।

ইঁদুর কপালে (হঠাতে ভাগ্যদয়)- ইঁদুরের সৌভাগ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় না তবে বিনা পরিশ্রমে পরগ্রহে বাস এবং পরামে পথ্য ইঁদুরের সৌভাগ্যের একটি লক্ষণ বটে।

উঠল বায, তো মক্কা যায (আকস্মিক সিদ্ধান্ত)- হজুগ। মক্কায় হজ করতে যেতে হলে তার পূর্ব প্রস্তুতি প্রয়োজন। অর্থ সংগ্রহ, নিয়ম কানুনের মান্যতা ইত্যাদির প্রয়োজন। হঠাতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেই মক্কায় যাওয়া যায় না।

উনিশ বিশ (অল্প পার্থক্য, প্রায় সমান সমান)- উনিশ এবং বিশ বা কুড়ি সংখ্যার মধ্যে তফাত মাত্র এক। অর্থাৎ সামান্যই পার্থক্য।

উলুবনে মুক্তা ছড়ানো (অপাত্রে উপদেশদান)- উলু অর্থ কাশ জাতীয় এক প্রকার ঘাস। উলুবনে যদি মুক্তা ছড়ানো হয় তাহলে সেই মুক্তা কারো চোখে পড়ে না, কারো কাজেও লাগে না। মুক্তাবর্ষণের উদ্দেশ্যেই ব্যর্থ। অপাত্রে জ্ঞানদান, উপদেশ বর্ষণেরও একই গতি।

উনপঞ্চাশ বায়ু (পাগলামি)- আযুবৰ্দে শাস্ত্রে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রি-দোষের উল্লেখ আছে। তার মধ্যে বায়ু কুপিত হলে মস্তিষ্ক দোষ ঘটে। শাস্ত্রের অন্যস্থানে উনপঞ্চাশ বায়ুর সন্ধান পাওয়া যায়। এখন যদি উনপঞ্চাশ বায়ুর সবগুলিই কুপিত হয় তাহলে মস্তিষ্ক বিকারের মাত্রা সহজেই অনুমেয়। সম্ভবত এই কারণেই উনপঞ্চাশ বায়ু বলতে পাগলামি, বখাটেপনা, বিশুজ্জল আচরণ ইত্যাদি বোঝানো হয়।

এক কলসি দুধে একফোটা গোমূত্র (সামান্য দোষ অনেক গুণকে নষ্ট করতে পারে)- এক কলসি দুধে সামান্য গোমূত্র পড়লে অপবিত্র হয়, তা আর দেবপূজায় লাগে না। মূত্রসংযুক্ত দুধ ফোটালে কা কেটে ছানা হয়ে যায়। অশেষ গুণের অধিকারী ব্যক্তিকে সামান্য ভুলের জন্য বদনাম কিনতে হয়।

একই টাকার এপিঠ ওপিঠ (একই বস্তুর দুই বহিরঙ্গ)- একটি মুদ্রার দু-পিঠ মুদ্রণে পার্থক্য থাকলেও তার উৎস একই এবং দোষগুণও একই। উৎস এক হলে বহিরঙ্গের তারতম্য ঘটলেও বস্তুস্তার পরিবর্তন ঘটে না।

ওস্তাদের মার শেষ রাতে (দক্ষ লোক তার দক্ষতা শেষ মুহূর্তে দেখায়)- ওস্তাদ= বড়ো সঙ্গীতশিল্পী, কসরৎওয়ালা, চতুর লোক। মার= আঘাত। ছোট ছোট সঙ্গীতশিল্পীদের অনুষ্ঠানের প্রথম দিকে সুযোগ দিয়ে বড়ো সঙ্গীতশিল্পী শেষ বেলায় তার সঙ্গীতের ওস্তাদি দেখায়।

দু কান কাটা (অতিশয় নির্লজ্জ)- পূর্বে কেউ কোন অপরাধ করলে তার একটা কান কেটে নিয়ে, অপমান করে ছেড়ে দেওয়া হতো। কানকাটা লোকটিকে দেখলে তাকে অপরাধী মনে করে সাধারণ লোক তার থেকে দূরে থাকতো। দু কান কাটা সেই যে এক কান কাটার ঘাওয়ার পরও নিজেকে সংশোধিত করেনি, ফলে তার দ্বিতীয় কান কাটা গেছে।

দুধের মাছি (সম্পদের সাথি)- মাছি সাধারণত নোংরা জিনিসেই বসে। এখানে দুধে মাছি বসার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ যে মাছি দুধে বসে এবং দুধ পচন্দ করে।

ধরাকে সরা জ্ঞান করা (অহংকারে সব কিছুকে অবজ্ঞা করা)- ধরা অর্থাৎ পৃথিবীর আকার বিশাল। সেই তুলনায় সরা পোড়ামাটির তৈরী পাত্র বিশেষ (অতিক্ষুদ্র)। বাহুবল, জনবল, ধনবল বা রাজনৈতিক বলে বলীয়ান অনেক অহংকারী ব্যক্তিই যিনি মহৎ তার মহস্তকে স্বীকার করে না। বৃহৎ প্রথিবীকে সে ক্ষুদ্র সরার মতো মনে করে।

ধামা চাপা দেওয়া (গোপন করা)- বেতের তৈরী ঝুড়িকে ধামা বলে। পূর্বে গৃহস্থ বাড়িতে ধান-চাল কলাই ইত্যাদি রাখার কাজে ধামা ব্যবহার করা হতো। আবার ওই সমস্ত জিনিসকে পশ্চ পক্ষীর নজর থেকে আড়াল রাখার জন্য মেঝেতে ঢেলে ধামাটা উপুড় করে চাপা দেওয়া হতো। এটিই ধামা চাপা দেওয়া অর্থাৎ অন্যের নজর আড়াল করার ব্যবস্থা।

না ঘরকা না ঘাটকা (উভয় দিকেই স্থিতিহীনতা, মধ্যবর্তী অবস্থা)- মূল কথাটি হিন্দিতে এইরূপ-ধোবিকা গাধা না ঘাটকা। ধোপার গাধা ঘরের কাজও করে, আবার কাচার জন্য ময়লা কাপড়-চোপড় ঘাটেও বয়ে নিয়ে যায়। তাই গাধাটিকে ঘরের ও বলা যাবে না, ঘাটের ও বলা যাবে না।

নাকানি চোবানি করা (বিপর্যস্ত করা)- নাকানি= নাক+গানি অর্থাৎ নাক পর্যস্ত জলে চোবানো। চোবানি বলতে বোঝায় একবার ডোবানো একবার ভাসানো। কাউকে এরূপভাবে হাবুড়ুরু খাওয়লে সে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

নাটের শুরু (অনিষ্টকারীদের পরিচালক)- নাট অর্থ অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদি বোঝায়।

নাটকোৎ বালু	চুম্বক চালু	গুরু	শালমি চুচু	পুরী
১০০০ মালুম	১০.০	১০০০	কাশীশুর	নী বড় বড়
কালু চীমালু	১০.০	১০০০	জীপানুকু মুর্দাপুরু	মুর্দাপুরু

১০

তারিখঃ ২৮-০৯-২০২২ইঁ

বরাবর,

অধ্যক, **লেখক**

রবীন্দ্র মেট্রী বিশ্ববিদ্যালয়

কুষ্টিয়া।

বিষয়ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য আবেদন।

জনাব,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিবেদন এই যে, গত ২৭.০৯.২০২২ তারিখে “দৈনিক দেশের কঠ”-এ বিজ্ঞপ্তির সুবাদে অবগত হয়েছি যে, আপনার প্রতিষ্ঠানে “প্রভাষক” নিয়োগ দেওয়া হবে। আমি উক্ত পদের একজন প্রার্থী হিসেবে আমার যোগ্যতা আপনার সুবিবেচনার জন্য নিচে উপস্থাপন করছি—

নামঃ	মোঃ বিজয় আলী
পিতার নামঃ	মোঃ আরিফ হোসেন
মাতার নামঃ	মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন
বর্তমান ঠিকানাঃ	গ্রাম: হিসনাপাড়া, ডাকঘর: তারাগুণিয়া-৭০৫১, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।
স্থায়ী ঠিকানাঃ	গ্রাম: হিসনাপাড়া, ডাকঘর: তারাগুণিয়া-৭০৫১, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।
জন্ম তারিখঃ	১৪-১২-১৯৯৯
জাতীয়তাঃ	বাংলাদেশী
ধর্মঃ	ইসলাম
মোবাইলঃ	০১৭৯৩-৬২৭২৮৬

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

পরীক্ষা	বিষয় / বিভাগ	সাল	গ্রেড পয়েন্ট	বোর্ড / প্রতিষ্ঠান
এস এস সি	মানবিক	২০১৬	৩.৩৩	যশোর বোর্ড
ডিপ্লোমা	কম্পিউটার টেকনোলজি	২০২০	৩.৭৫	কারিগরি বোর্ড
বিএসসি	কম্পিউটার সায়েন্স	”	”	”

অতএব, জনাবের নিকটে আমার আকুল আবেদন এই যে, আমাকে আপনার প্রতিষ্ঠানে “প্রভাষক” হিসাবে নিয়োগ পেতে আপনার একান্ত মর্জি হয়।

নিবেদক,

সংযুক্তি

- ১) সকল পরীক্ষার সনদের ফটোকপি।
- ২) জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি।
- ৩) সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি ছবি।
- ৪) জাতীয়তা ও চারিত্রিক সনদপত্র।

ভাষা বলতে কী বোঝা? সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য আলোচনা কর।

ভাষা ভাবের বাহন। ভাব প্রকাশের তাগিদে ভাষার উজ্জব। মানুষের সহজাত প্রবণতাই হল একের ভাব অন্যের হস্তয়ে সঞ্চারিত করে একই ভাবে ভাবিত করানো। ভাষার প্রধান কাজ হল একর ভাব অনেকের কাছে পৌছে দেওয়া। ভাষা জীবনাভূতির বাহন। ভাষা হল পরপর ধ্বনি ব্যবহারি করে অর্থ প্রকাশের মানবিক উপায়। ভাষার এক প্রাণে ধ্বনি, আর এক প্রাণে অর্থ-এই হল মূল কথা।

বাগ্যত্বের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম ভাষা। অর্থাৎ ভাষা হল পরপর ধ্বনি ব্যবহার করে অর্থ প্রকাশের মানবিক উপায়।

প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, মনের ভাব-প্রকাশের জন্য বাগ্যত্বের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনো বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্য প্রযুক্ত, শব্দ-সমষ্টিকে ভাষা বলে।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ভাষার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন, মনুষ্যজাতি যে ধ্বনি বা ধ্বনিসকল দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, তাহার নাম ভাষা।

ড. সুকুমার সেনের মতে, মনের ভাব প্রকাশের নিমিত্তে বিভিন্ন জাতির বা সমাজের সকল সভ্যের বোধগম্য বাক্যসমূহের সমষ্টিকে সেই জাতির ভাষা বলে।

ভাষাবিদ্ অশোক মুখোপাধ্যায়ের মতে, কর্তৃনিঃসৃত অর্থবহ ধ্বনি সমষ্টির সাহায্যে মানুষের মনের ভাব প্রকাশ ও আদান প্রদানের স্বাভাবিক মাধ্যমের নাম ভাষা।

সাধু ভাষা বা সাধু বীতি

উনিশ শতকে বাংলার যে লিখিত-রূপ গড়ে উঠে তার নাম দেওয়া হয় সাধু ভাষা। সংস্কৃত ব্যৃত্তিসম্পন্ন মানুষের ভাষাকে সাধু ভাষা বলে প্রথম অভিহিত করেন রাজা রামমোহন রায়। পরে রামমোহন রায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্ষ্মা, দৈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বক্ষিমচন্দ্র প্রমুখ গদ্যশিল্পীগণ এই সাধু ভাষার মাধ্যমেই তাঁদের সাহিত্যকীর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বঙ্গুত্তা, নাটক ও আলাপচারিতার অনুপযোগী বলে এই ভাষা কৃত্রিম এবং শুধু লেখ্য ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত। সাধু ভাষায় সংস্কৃত শব্দের পাশাপাশি অ-সংস্কৃত শব্দও অনেক ব্যবহৃত হয়েছে।

চলিত ভাষা বা চলিত বীতি

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দেশ প্রথমেই চলিত ভাষার প্রচলন শুরু হয় বাংলা সাহিত্যে। সংস্কৃতবহুল সাধু ভাষার বহুল প্রচলনের ফলে বাংলা গদ্য নিছক পগুতিগদ্যে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। এর ফলে গদ্যের গতিশক্তি শিথিল ও মচুর হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে চলিত ভাষার সাহিত্যিক রূপের প্রথম প্রকাশ ঘটে টেকচাদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাসে। প্রথম চৌধুরী সম্পাদিত সবুজপত্র এর প্রকাশ চলিত ভাষাকে সাহিত্য ভাষা রূপে গ্রহণের সপক্ষে যে

আন্দোলনের সূত্রপাত করে, রবীন্দ্রনাথ তার পুরোভাগে এসে দাঢ়ান। প্রথম চৌধুরী লিখলেন, ‘শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়।’

কালি-কলম ও কলোল গোষ্ঠীর লেখকদের সঙ্গে অনুদাশকর রায়, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর রায় প্রমুখ খ্যাতিমান লেখকেরা চলিত ভাষাকে সাহিত্যের উপযোগী শক্তি ভিত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পরিণত বয়সের রচনায় এ চলিত ভাষাকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন। এ ভাষা সম্পর্কে উচ্ছাসিত হয়ে তিনি বলেন, এর (চলিত ভাষার) নিজের একটি কল্পনি আছে। আমার শেষ বয়সের কাব্য-রচনায় আমি বাংলার এই চলিত ভাষার সুরটাকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কেননা দেখিয়াছি চলিত ভাষাটাই স্নেতের জলের মত চলে।

প্রথ্যাত বৈয়াকরণ ও ভাষাতাত্ত্বিক ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, সাধারণ গদ্য-সাহিত্যে ব্যবহৃত বাঙালা ভাষাকে সাধু ভাষা বলে।

প্রথ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী আনন্দের ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা, সমগ্র বাঙালাদেশের শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক শ্রেষ্ঠ মৌখিক ভাষা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই মৌখিক ভাষাকে বিশেষভাবে চলিত ভাষা বলা হয়।

সাধু ও চলিত ভাষারীতির পার্থক্য

সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
১. উনিশ শতকের শুরুতে সংস্কৃতানুসারি পণ্ডিতদের আয়োজনে যে সাহিত্যিক গদ্য ভাষার উন্নোষ তাই সাধু ভাষা।	১. বিশ শতকের শুরুতে প্রথম চৌধুরীর সবুজপত্রের আহবানে ভাগীরথী নদীর দুটীরবর্তী অঞ্চলের ভাষাকে ভিত্তি করে যে মৌখিক ভাষা সাহিত্যিক গদ্য ভাষার মর্যাদা লাভ করে, তা-ই চলিত ভাষা।
২. সাধু ভাষায় সর্বনাম পদের পূর্ণরূপ গৃহীত হয়। যেমন: তাহার, ইহার, কাহাকে ইত্যাদি।	২. চলিত ভাষায় সর্বনাম পদের সংক্ষিপ্ত রূপ গৃহীত হয়। যেমন: তার, এর, কাকে ইত্যাদি।
৩. সাধু ভাষায় ক্রিয়াপদগুলোর পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: খাইতে, খাইতেছিলাম, করিতেছিলাম ইত্যাদি।	৩. চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন: খেতে, খাইছিলাম, করছিল ইত্যাদি।
৪. সাধু ভাষায় তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের সমধিক প্রয়োগ। যেমন: চন্দ, অভ্যন্তর, অঙ্গ ইত্যাদি।	৪. চলিত ভাষায় তৎব, দেশি-বিদিশি ইত্যাদি শব্দের প্রাধান্য। যেমন: চাঁদ, ভিতর, শরীর ইত্যাদি।
৫. সাধু ভাষায় সংক্ষি, সমাসের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন: কাঠাহরণে, রাজাজ্ঞা, রাজপুত্রহন্তে ইত্যাদি।	৫. চলিত ভাষায় সংক্ষি, সমাসের বর্জন বা সেগুলোকে ভেঙ্গে সহজ করে লেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন: কাঠ আনতে, রাজার হৃকুম, রাজপুত্রের হাত ইত্যাদি।
৬. সাধু ভাষায় বাক্যে পদবিন্যাস সুনিয়ত্বিত।	৬. চলিত ভাষার পদস্থাপনের রীতি অনেক সময় পরিবর্তিত হয়।
৭. সাধু ভাষায় দূরহ তৎসম শব্দের ব্যবহার চলে। তবে সাধু ভাষায় ব্যবহৃত অনেক শব্দই বর্তমানে অপ্রচলিত। যেমন: নিষ্পঁ।	৭. চলিত ভাষায় দূরহ তৎসম শব্দের ব্যবহার একবারেই অচল।

৮. সাধু ভাষায় অনুসর্গের পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: জন্য, হইতে, দ্বারা ইত্যাদি।	৮. চলিত ভাষায় অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: জন্যে, হতে, থেকে।
৯. সাধু ভাষা সুনির্ধারিত ব্যাকরণের অনুসরণ করে চলে এবং এর কাঠামো অপরিবর্তনীয়।	৯. চলিত রীতির ব্যাকরণ না থাকায় এর অনুসৃতি কষ্টসাধ্য এবং এর কাঠামো পরিবর্তনশীল।
১০. সাধু ভাষা কথপোকথনে, নাটকের সংলাপে ও বক্তৃতায় অনুপযোগী।	১০. চলিত ভাষা কথপোকথনে, নাটকের সংলাপে ও বক্তৃতায় বেশি উপযোগী।
১১. সাধু ভাষা গুরুগভীর ও আভিজাত্যের অধিকারী।	১১. চলিত ভাষা সহজবোধ্য, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ ও কৃত্রিমতাবর্জিত।
১২. সাধু ভাষা সার্বজনীন লেখ্য ভাষা।	১২. চলিত ভাষা শিক্ষিত ভদ্রসমাজের মৌখিক ও লেখ্য ভাষা।

ধ্বনি (Sound)

সাধারণত ইংরেজিতে Sound বলতে আমরা যা বুঝি বাংলায় ধ্বনি কলতে তা-ই বোঝায়। ব্যাপক অর্থে পাখির কলধ্বনি, হাততালির শব্দ, বংশীধ্বনি থেকে শুরু করে মানুষের মানুষের কষ্ট থেকে উচ্চারিত ধ্বনি পর্যন্ত সবকিছুই ধ্বনি বা Sound। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানে এই সব রকমের ধ্বনি বা Sound আলোচ্য নয়। মানুষের বাগ্যস্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিই শুধু আলোচ্য। ফুসফুস তাড়িত বাতাসের নির্গমনের ফলে সাধারণত ধ্বনির সৃষ্টি হয়।

ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি। এক-এক রকম ধ্বনিসমষ্টি নিয়ে এক একটি ভাষা এবং নানা দেশের নানা ধ্বনিমূলের সমষ্টি নানান ভাষা। যেমন- বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, জার্মানী নানা দেশে নানা ভাষা প্রচলিত।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এর মতে, “কোনও ভাষার উচ্চারিত শব্দকে (word) বিশ্লেষণ করিলে আমরা কতকগুলো ধ্বনি (Sound) পাই।”

মুহাম্মদ আবদুল হাই বলেছেন, “মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিকতা বজায় রাখতে হলে তার প্রধান উপায় কথা বলা, মুখ খোলা, আওয়াজ করা।... সে আওয়াজ বা ধ্বনিগুলোর একমাত্র শর্ত হচ্ছে যে সেগুলো অর্থবোধক হওয়া চাই। অর্থহীন ধ্বনিও মানুষ করতে পারে কিন্তু তাতে সমাজ-জীবন চলে না।”

ড. হ্যায়ুন আজাদ এর মতে, “প্রতিটি মানব-ভাষায় থাকে একগুচ্ছ ধ্বনি, সাধারণত বারোটির বেশি ও ষাটটির কম। কোনো ভাষায়ই নেই অসংখ্য বা বিপুল সংখ্যক ধ্বনি। ওই মুষ্টিমেয় ধ্বনির বিভিন্ন বিন্যাসে গঁড়ে ওঠে ভাষার বিপুল পরিমাণ শব্দ। প্রতিটি ভাষার নিজস্ব ধ্বনিরাশির প্রত্যেকটির যেমন থাকে তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, তেমনি ওই ধ্বনিরাশি পরল্পরের সঙ্গে সহাবস্থান করে সুশৃঙ্খল ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মকানুন মেনে। অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষার রয়েছে ধ্বনিশৃঙ্খলা বা ধ্বনিসংগঠন।”

ব্যাকরণের ভাষায়, “মনের ভাব প্রকাশের জন্য মুখ থেকে যে অর্থবোধক আওয়াজ বা শব্দ বের হয় তাকে ধ্বনি বলে।”

বর্ণ (Letter)

যে-সব প্রতীক বা চিহ্ন দিয়ে ধ্বনি নির্দেশ করা হয় তাকে বর্ণ বলে। যেমন- অ, আ। ধ্বনি মুখে উচ্চারিত হয়। তারই লিখিত প্রতীক হলো বর্ণ। বর্ণ ধ্বনির লিখিত রূপ। ধ্বনি আমরা মুখে উচ্চারণ করি, কানে শুনি কিন্তু চোখে দেখি না। বর্ণ আমরা চোখে দেখি এবং নীরব বা সরবে পড়ি।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এর মতে, “যে ধ্বনি কানে শোনা যায়, তাকে নির্দিষ্ট রূপ দিয়ে প্রত্যক্ষ বক্তৃর রূপে চোখের সামনে তুলে ধরা হয়। ধ্বনির এই লিখিত রূপ বা চিহ্নকে বলে বর্ণ।”

অক্ষর (Syllable)

সাধারণত অর্থে অক্ষর বলতে বর্ণ বা হরফ কে বোঝালেও প্রকৃত প্রস্তাবে অক্ষর ও বর্ণ পরল্পরের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ নয়। অক্ষর হচ্ছে বাগ্যস্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ। ইংরেজিতে আমরা যাকে Syllable বলে অভিহিত করি তাই অক্ষর। যেমন- বাংলায় ‘বন্দন’ শব্দেও বন্ন+ধন্ন এই দুটো অক্ষর, কিন্তু ব-ন্ন-ধ-ন্ন- এগুলো অক্ষর নয়; এগুলো বর্ণ বা হরফ মাত্র।

মুহাম্মদ আবদুল হাই বলেছেন, “নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একই বক্ষঢ়স্পন্দননের ফলে (by a single breath pulse) যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একবারে উচ্চারিত হয় তাকেই অক্ষর বলা যেতে পারে।”

মোহাম্মদ মনিরজ্জামান বলেন, “এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টির নাম অক্ষর।”

শ্রী অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেন, “বাগ্যস্ত্রের স্বল্পতম প্রচেষ্টায় উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকেই অক্ষর বলে।”

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর মতে, “কোনও শব্দে যখন যে ধ্বনিসমষ্টি এক সময়ে একত্রে উচ্চারিত হয়, তাহাকে অক্ষর বলে।”

ণত্ব ও ষত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ণ এবং মূর্ধন্য-ষ ধ্বনির ব্যবহার নেই বলে বাংলা দেশি, তত্ত্ব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ণ বা মূর্ধন্য-ষ লেখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বহু তৎসম বা সংকৃত শব্দে মূর্ধন্য-ণ এবং মূর্ধন্য-ষ রয়েছে। সে-সব বাংলায় অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত হয়। অর্থাৎ ণত্ব ও ষত্ববিধি শুধু তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অতৎসম শব্দে নয়।

ণত্ব বিধান: যে রীতি অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম বা সংকৃত শব্দের বানানে 'ন' (দন্ত্য-ন) স্থানে 'ণ' (মূর্ধন্য-ণ) ব্যবহৃত হয় তাকে ণত্ব-বিধান বলে। অর্থাৎ তৎসম শব্দের বানানে ণ-এর সঠিক ব্যবহারের নিময়ই ণত্ব বিধান। যেমন: ঝণ, মৱণ, ভাষণ, আমন্ত্রণ, প্রণীত, রক্ষণ, শ্রবণ, গবেষণ্য ইত্যাদি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছেন, শুধু সংকৃত শব্দে যেখানে মূর্ধন্য-ণ আছে, বাংলা ভাষায় ব্যবহারের সময় সেখানে তাই রাখতে হবে। এটাই ণত্ব-বিধান।

ণত্ব-বিধানের নিয়মাবলি

সাধারণভাবে তৎসম শব্দে ঝ, র, ষ এর পরে মূর্ধন্য 'ণ' ব্যবহৃত হবে। (তৎসম শব্দে র-ফলা, রেফ, ক্ষ-এর পর মূর্ধন্য-ণ ব্যবহৃত হয়। যেমন:-

র- অরণ্য- উদাহরণ, ধারণ, পুরাণ, প্রচারণা, হরিণ, উত্তরণ, বিতরণ, ব্যাকরণ ইত্যাদি। রেফ-আকীর্ণ, পূর্ণিমা, বিদীর্ণ, কৰ্ণ, বর্ণনা, পূৰ্ণ, জীৰ্ণ, চূৰ্ণ ইত্যাদি।

র-ফলা- প্রণয়, প্রণাম, প্রাণ, প্রাণী, মুদ্রণ, আণ, শ্রেণি, পরিআণ, ব্রণ ইত্যাদি।

ঝ/ঝ-কার- ঝণ, ঘণা, তৃণ, মসৃণ, মৃণাল ইত্যাদি।

ষ- অন্ত্বেষণ, পাষণ, শোষণ, বিষণ্ন, দূষণ, ভাষণ, বিভীষণ, ঘোষণা, আকর্ষণ ইত্যাদি। ক্ষ- ক্ষণ, নিরীক্ষণ, লক্ষণ, দক্ষিণ, সমীক্ষণ, প্রদক্ষিণ, পর্যবেক্ষণ, ভক্ষণ ইত্যাদি।

ট-বর্গের ট ঠ ড ঢ এই চারটি বর্ণের পূর্বে যদি ন ধ্বনি থাকে এবং ন সহযোগে যদি যুক্তবর্ণ তৈরি হয়, তা হলে তা সর্বদা মূর্ধন্য ণ হবে। যেমন:

ণ+ট=ট- কণ্টক, ঘটা, বটন, নিষ্কণ্টক।

ণ+ঠ= ঠ- সুকঠী, ময়ূরকঠী, উপকঠ, কঠনালি, উকঠ, কঠ, উৎকঠ।

ণ+ড= গু- কাগ, দগ, ভগ, ভুঁথগ, মানদগ, পাষগ, মেরংদগ, পাঞ্চলিপি, ঠাগা, বায়ুমণ্ডল, উক্ষাপিণি, ভঙ্গামি, প্রচগ ইত্যাদি।

পরি, প্র, নির এ তিনটি উপসর্গের পর ণত্ব বিধি অনুসারে ন ধ্বনি মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন: পরিণত, পরিগাম, প্রণয়, প্রবীণ, প্রমাণ, প্রয়াণ, প্রণয়ন, প্রবাহিণী ইত্যাদি।

উত্তর, পর, পার, রবীন্দ্র, চন্দ্র, নার, রাম শব্দের পরে অয়ন শব্দ হলে দণ্ড ন পাল্টে মূর্ধন্য ন হয়। যেমন: উত্তর+অয়ন= উত্তরায়ণ, পর+অয়ন= পরায়ণ, পার+অয়ন= পারায়ণ, রবীন্দ্র+অয়ন= রবীন্দ্রায়ণ, চন্দ্র+অয়ন চন্দ্রায়ণ, নার+অয়ন=নারায়ণ রাম+অয়ন রামায়ণ ইত্যাদি।

অপর, পরা, পূর্ব, প্র এই কটি পূর্বপদের পর অঙ্গ শব্দ বসলে গত্ত বিধি অনুসারে দণ্ড ন এর জায়গায় মূর্ধন্য ন হয়। যেমন: প্র+অ=প্রাহ, অপর+অ= অপরাহ ইত্যাদি।

তা ছাড়া এমন অনেক শব্দ আছে যেখানে স্বভাবতই মূর্ধন্য ন বসে। যেগুলোকে কোনো নিয়মের সূত্রে ফেলা যায় না। যেমন: কণা, ফণা, ভণিতা, বীণা, নিপুণ, শাণ, কল্যাণ, বাণ, কোণ, বণিক, বাণী ইত্যাদি।

এই গত্ত-বিধান বিদেশি শব্দ অথবা বিদেশি নামের বানানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ এ সকল ক্ষেত্রে মূর্ধন্য ন এর স্থলে সর্বদা দণ্ড ন ব্যবহৃত হবে। যেমন: গ্রিন, ব্রেইন, আয়রন, ইরান, কেরানি, কোরান, সাইরেন, স্যাকারিন, ফার্নিচার ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদে সর্বদা দণ্ড ন হয়। যেমন: করুণ, ধরুণ, ধরেন ইত্যাদি।

ষত্ত্ব-বিধান: যে রীতি অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ষ ব্যবহৃত হয় তাকে ষত্ত্ব-বিধান বলে। অর্থাৎ তৎসম শব্দের বানানে ষ-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ষত্ত্ব-বিধান। যেমন: বিষ, কৃষক, আষাঢ়, আভাষ ইত্যাদি।

ষত্ত্ব-বিধানের নিয়মাবলি

শিস্ ধ্বনি: বাংলায় মোট শিস্ ধ্বনি ৪টি। শ, ষ, স ও ই। এই ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমরা শ্বাস যতক্ষণ খুশি রাখতে পারি। এদের উচ্চারণে মুখবিবরে কোথাও বাধা না পেয়ে কেবলমাত্র ঘর্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং শিস্ ধ্বনির সৃষ্টি করে বলে এদেরকে শিস ধ্বনি বলে।

বাংলায় শিস্ ধ্বনির অক্ষর তিনটে- শ, স, ষ এবং এদের বানানে অনেক সময় গওগোল সৃষ্টি হয়। অথচ একই ধ্বনির জন্যে। একটিই বর্ণ হবে-এ ক্ষেত্রে সেটাও চলছে না: বিশ (২০ সংখ্যা), বিষ (গরল), বিস (পদ্মের ডাটা)। তিন জায়গাতেই উচ্চারণ একই অথচ শ/ষ/স অক্ষরের জন্যে অর্থ পাল্টে গেল। ফলে ষত্ত্ব-বিধান অবহেলা করার উপায় নেই।

ঝ বা ঝ-কারের পরে মূর্ধন্য-ষ হবে। যেমন- কৃষক, কৃষি, তৃষা, বৃষ্টি, দৃষ্টি, সৃষ্টি।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব পাচ হাজার বছর আগে ইউরোপের মধ্যভাগ থেকে দক্ষিণ-পূর্বাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে একটি জাতি বসবাস করত এবং তারা মুটামুটি একই ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করত। তাদের ব্যবহৃত ভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। ইন্দো-ইউরোপীয় নামটি প্রথম ব্যবহার করেন থমাস ইয়াং (১৭৭৩-১৮২৯)। নামের একজন চিকিৎসক। মূলত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটেছে।

পণ্ডিতগণ বিশ্বের প্রচলিত এবং লুপ্ত ভাষাগুলোর ইতিহাস বিচার করে তাদের কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম ভাষা-গোষ্ঠী ইন্দো-ইউরোপীয়। এ ভাষা-গোষ্ঠীকে আবার আটটি প্রধান শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। ভাষাতত্ত্বিক অধ্যাপক অ্যাসকেলি (Ascoli) আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে সৃষ্টি ভাষাগুলো প্রধান দুইটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা-ক. কেন্ত্রম . খ. শতম। গ্রিক, ইতালি, কেলটিক, জার্মানিক- পশ্চিমাংশের ভাগ (মূলত ইউরোপীয়), যার নাম ‘কেম’ (Centum) এবং আর্য (ইন্দো-ইরানীয়), বালটোঝান্ডিক, আর্মেনীয়, আলবেনীয়পূর্বাংশ ভাগ (মূলত এশীয়) যার নাম ‘সতম’ (Satem)।

শতম বিভাগ থেকে যে আর্য শাখা উত্তৃত হয় তার সাথে বাংলা সম্বন্ধ রয়েছে। আর্য শাখার দুইটি প্রধান প্রশাখা স্বীকার করা হয়েছে। যথা- ক. ইরানী ও খ. ভারতীয়। এই দুই প্রশাখার মধ্যবর্তী একটি প্রশাখাকে দারদী (Dardie) আখ্যা দেয়া হয়েছে।

বাঙালি জনসাধারণ প্রথম থেকেই বাংলা ভাষায় কথা বলত না, অর্থাৎ বাংলা ভাষার পূর্বেও এদেশে ভাষা ছিল, তবে তা বাংলা ভাষা ছিল না। এর রয়েছে সুনীর্ধ ইতিহাস ও বিবর্তনধারা। আমরা জেনেছি যে ভাষার ধর্মই হলো পাল্টে যাওয়া। এ ভূখণ্ডের ভাষাও অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় উপনীত হয়েছে।

বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত। ড, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক পাঁচ হাজার পূর্বে এই মূল ভাষার অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করেন। আনুমানিক আড়াই হাজার খ্রিস্ট পূর্বাব্দে মূল ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে সব প্রাচীন শাখার সৃষ্টি হয়, তার অন্যতম হচ্ছে আর্য শাখা। এ থেকেই ভারতীয় আর্যভাষার সৃষ্টি। বাংলা এই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা গোষ্ঠীর অন্যতম ভাষা হিসাবে বিবর্তিত হয়েছে বলে প্রাক আর্য যুগের অস্ত্রিক ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট নয়। তবে সে সব ভাষার শব্দসম্ভার বাংলা ভাষায়

রয়েছে। আর্যরা এ দেশে বসবাস শুরু করলে তাদের ভাষাই বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে।

বস্তুত খ্রিস্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে আর্যগণ ভারত উপমহাদেশে আগমন করেন। তাদের ধর্মগ্রন্থ বেদ ও ব্রাহ্মণ-সংহিতার ভাষা। অর্থাৎ বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষাই ছিল আর্য ভারতীয়দের প্রাচীনতম সাহিত্যিক ভাষা। এই প্রাচীনতম সাহিত্যিক ভাষা পরবর্তী কালে নানাভাবে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। ভাষাতত্ত্বিগণের মতে বাংলা ভাষা কোন স্বতন্ত্র ভাষা নয়- একটি রূপান্তরিত ভাষারূপ। বৃহত্তম বঙ্গ অঞ্চলে অধিবাসীদের দ্বারা ব্যবহৃত বলে এই ভাষার নামকরণ হয়েছে 'বাংলা ভাষা'। বৈদিক ভাষা থেকে বাংলা ভাষা পর্যন্ত বিবর্তনের প্রধান তিনটি ধারা-

ক. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (Old Indo-Aryan): এর কালসীমা খ্রি: পূঃ ২০০০ অব্দ থেকে খ্রি: পূঃ ৬০০ অব্দ পর্যন্ত। এ ভাষার আবার তিনটি স্তর বিদ্যমান

১. বৈদিক বা ছান্দস ভাষার স্তর

২. সংস্কৃত ভাষার স্তর।

৩. বৌদ্ধ-সংস্কৃত ভাষার স্তর।

খ. মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষা (Middle Indo-Aryan): এর কালসীমা খ্রি: পূঃ ৬০০ অব্দ থেকে ৯৫০ অব্দ পর্যন্ত। এর তিন উপস্তর-

১. প্রথম স্তরঃ অশোকের অনুশাসন, লিপি, সাচি, খারবেল লিপি প্রভৃতির ভাষা। পালি এর সাহিত্যিক রূপ। সংস্কৃত এই যুগের ব্রাহ্মণ্য সমাজের সাহিত্যিক ভাষা ছিল। এটা আদিম ও মধ্যস্তরের অন্তর্বর্তী। ৫০০ খঃ পূঃ হতে ১০০ খঃ পূঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। একে প্রাচীন প্রাকৃত বলা যায়।

২. দ্বিতীয় স্তরঃ নাটকীয় ভাষা। ২০০ খ্রি: পূঃ হতে ৬০০ খ্রি: পূঃ পর্যন্ত। একে মধ্য প্রাকৃত বলা হয়।

৩. তৃতীয় স্তরঃ অপভ্রংশ স্তর। খ্রিস্টাব্দ ৬০০-১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

গ. নব্য-ভারতীয় আর্যভাষা (New Indo Aryan) : এর কালসীমা খ্রি: ৯৫০ থেকে আধুনিক সময়সীমা পর্যন্ত। এর স্তর তিনটি-

১. প্রাচীন যুগের বাংলা। কালসীমা ৯৫০ খ্রি: থেকে ১২০০ খ্রি:।

২. মধ্যযুগের বাংলা। কালসীমা ১২০০ খ্রি: থেকে ১৮০০ খ্রি:।

৩. আধুনিক যুগের বাংলা। কালসীমা ১৮০০ খ্রি: থেকে আধুনিক কাল।

আর্যগণ যে ভাষায় বেদ-সংহিতা রচনা করেছিলেন, সেই ভাষাই বৈদিক ভাষা নামে পরিচিত। আর্য- শাখার প্রাচীন। ভারতীয় আর্যভাষার স্তরে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। জনতার প্রভাবে এ ভাষা পরিবর্তিত হয়ে মধ্য ভারতীয়। আর্যভাষার স্তরে আসে। প্রথম পর্যায়ে পালি এবং পরে প্রাকৃত ভাষা নামে তা চিহ্নিত হয়। এই বিবর্তনের ধারাটি ছিল এরকম যে, কালক্রমে দেখা যায় বৈদিক ভাষা উচ্চারণের অপপ্রয়াণেগ ও স্থানীয় অনার্যদের ব্যবহৃত শব্দের মিশ্রণ প্রভৃতির কারণে ভাষা তার মূল রূপ বা কৌলিন্য বজায় রাখতে অক্ষম হয়। তাছাড়া বৈদিক দেব-দেবী ও বৈদিক যজ্ঞকার্য অপ্রচলিত হয়ে পড়লে সাধারণভাবে এই ভাষা অপ্রচলিত হয়ে পড়তে থাকে। তখন পাণিনি, দন্তী, বাহু প্রমুখ পঞ্চিতবর্গ। এই ভাষার সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হন। এই সংস্কারের ফল হল সংস্কৃত ভাষা। খ্রিঃ পৃঃ ৪০০ অন্দের দিকে ব্যাকরণবিদ পাণিনি এই ভাষার সংস্কার সাধন করে ব্যাকরণের সূত্র নির্দিষ্ট করে দেন। পাণিনির সূত্র অনুযায়ী নির্দিষ্ট ভাষাই সংস্কৃত ভাষা নামে প্রসিদ্ধ। আর্যরা সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা বলতেন এবং এই সংস্কৃত ভাষা সেকালের সাহিত্য ও সংস্কৃত চর্চার বাহন হয়ে সমগ্র আর্যবর্তে ও বাংলাদেশ প্রসার লাভ করে কালক্রমে আর্যদের সঙ্গে এদেশীয় অনার্যদের ঘনিষ্ঠ মিশ্রণের। ফলে ভাষার মিশ্রণও দেখা দেয়। এই ভাষাতেই দেশের প্রকৃতিপুঁজু' বা জনসাধারণ কথা বলত, এই জন্য একে বলা হয় প্রাকৃত-ভাষা।

প্রাকৃত শব্দের ভাষাগত অর্থ প্রকৃতি বা জনসাধারণের ভাষা। সংস্কৃতই আবার যে ভাষার প্রকৃতি বা উৎস এই দুইটি অর্থেই প্রাকৃত শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। এই প্রাকৃত ভাষার কালসীমা খ্রিঃ পৃঃ ২০০ খ্রিঃ - ৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্য সংস্কৃত কাব্য ও নাটকে প্রাকৃত ভাষার প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। প্রাকত ভাষা মুখ্যত কথ্য ভাষা হলেও তার সুনাল। ব্যাকরণ ছিল এবং তাতে কাব্য নাটক ইত্যাদি রচিত হয়েছিল। অঞ্চল ভেদে প্রাকৃত ভাষা কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে শ্রীরসেনা প্রাকৃত, মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত মাগধী প্রাকৃত অর্ধ মাগধী বা মাগধী প্রাকৃত ও পৈশাচী প্রাকৃত উল্লেখের দাবী রাখে।

এই সকল প্রাকৃত ভাষা জনসাধারণ কর্তৃক নিত্য ব্যবহারের ফলে ক্রমেই উচ্চারণে শৈথিল্য ঘটতে থাকে এবং ব্যাকরণের নিয়মকানুন লংগিত হতে থাকে। ফলে নানারূপ 'অপভ্রংশের কাল সীমা খ্রিস্টীয় ৬০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টীয় ১০০০ অব্দ পর্যন্ত। এই অপভ্রংশ ভাষা সমষ্টি থেকেই আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাবলীর জন্ম হয়েছে। পূর্বভারতে প্রচলিত মাগধী অপভ্রংশ থেকেই খ্রিস্টীয় দশম শতকের কাছাকাছি সময়ে বাংলা ভাষার উত্তর হয়েছে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল ৭ম শতক।।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের রূপরেখা নিম্নরূপ :

এখানে রেখ চিত্র যাবে.....

বস্তুত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারা যেন অনেকটা গতিশীল নদীর মত। নদীর মতই একদিন তার যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল। এর উৎসমুখ বেদ-সংহতির ভাষা থেকে। তারপর নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হতে হেতে বর্তমান ভাষারূপ লাভ করেছে। বাংলা ভাষার আদি সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাচর্য বিনিশ্চয়¹ গ্রন্থে আদিম বাংলা সঙ্গে প্রচুর শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাব দেখা যায়। এরপর মধ্যযুগের বাংলা ভাষার কাল অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য' মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার নিদর্শন বহন করে। ঘোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অর্থাৎ ভারত চন্দ্রের মৃত্যু (১৭৬০) পর্যন্ত মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার অন্ত পর্যায় বিস্তৃত। এই স্তরে বাংলা ভাষার রূপান্তর প্রায় আধুনিক কালের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। বৈক্ষণ্ব সাহিত্য ও পৌরাণিক অনুবাদ সাহিত্যের। প্রভাবে ভাষার প্রচুর তৎসম শব্দ- অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ হতে আরম্ভ করে এবং এরই সঙ্গে ইসলামী শব্দেরও ব্যবহার বাংলা ভাষায় প্রচুর হতে থাকে। এরপর ১৮০০ শতকে ইংরেজ আমল শুরু হলে, বিদেশী শিক্ষা-সংস্কৃতির বাহনরূপে ইংরেজি-ফারসি-পর্টুগীজ শব্দও বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে স্থান পায়। আধুনিক কালে এসে এই বাংলা গদ্য বাঞ্ডালির। চিত্র প্রবাহের প্রধান বাহন হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালাচেনা করলে দেখা যায় যে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন চিন্তা ভাবরাজির অভিনবত্বের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলা ভাষার সুসংহত রূপ। বাংলা ভাষার উত্তরবলশ্ব হতে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজও এগিয়ে চলছে ভবিষ্যৎ গন্তব্যে।

যতিচ্ছ বা ছেদচ্ছ বা বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার

যে কোনো ভাষায় লেখ্য রূপে যতি চিহ্ন অপরিহার্য। মুখে কথা বলার সময় কখনোই কেউ হড়মুড় করে সব বলে ফেলে না। দম নেওয়ার জন্য তাকে মাঝে মাঝে থামতে হয়; সেই থামায় আবার রকমফের আছে। কখনো বেশিক্ষণ থামতে হয়, কখনো বা অল্পক্ষণ। গলার স্বরের ওঠানামায় বা বলার ঢংয়ে বঙ্গর মেজাজ ধরা পড়ে। অবাক হওয়া বা প্রশ্ন করা, অনুরোধ করা বা ধমক দেওয়া ইত্যাদি সবই ফুটে ওঠে কথা বলার ভঙ্গিমার ভেতর দিয়ে।

বাক্যের বিভিন্ন ভাব সার্থকভাবে প্রকাশের জন্যে কঠস্বরের উপর তারতম্য বোঝাতে বর্ণের অতিরিক্ত যে-সব চিহ্ন ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে বলে বিরাম চিহ্ন। এগুলোকে ভাষা-চিহ্নও বলে। বিরাম চিহ্ন কথার অর্থ যে চিহ্নের সাহায্যে কথা বলার সময় জিভের কাজের বিরাম ঘটে বা বিরাম নির্দেশিত হয়। মনোভাব প্রকাশের সময় অর্থ ভালভাবে বোঝানোর জন্যে উচ্চারিত জন্যে কিছু সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে বিরাম-চিহ্ন বা যতিচ্ছ বা ছেদচ্ছ বা ভাষা-চিহ্ন নামে পরিচিত এবং একই অর্থে ব্যবহৃত।

বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য বাক্যের মধ্যে বা বাক্যের সমাপ্তিতে কিংবা বাক্যের আবেগ, জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশ। করার উদ্দেশ্যে বাক্য-গঠনে যেভাবে বিরাম দিতে হয় এবং লেখার সময় বাক্যের মধ্যে তা দেখাবার জন্য যে-সব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার ব্যবহার করা হয়, তা-ই যতি বা ছেদ-চিহ্ন বা বিরাম-চিহ্ন।

বিরাম-চিহ্ন ব্যবহারের বিষয়টিকে ইংরেজিতে বলে Punctuation। এর মূল গ্রিক শব্দ Punctus-যার অর্থ বিন্দু। এই বিন্দু ব্যবহৃত হত হিঙ্গ ভাষার লিপিতে ব্যঙ্গনধ্বনির সাথে স্বরধ্বনির সংকেত হিসেবে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে। কেবল এক দাঁড়ি (।) ও দুই পাঁড়ি (॥) এই দুটি বিরাম চিহ্নের ব্যবহার হত। আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যে গদ্যের উৎপত্তি হলে এই এক দাঁড়ি (।) বিরাম চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হত। অন্য সকল বিরাম চিহ্ন এসেছে ইংরেজি সাহিত্য থেকে। বাংলা মুদ্রণের প্রথম কাজ শুরু হয় ইংরেজদের হাতে। গদ্য রচনাকে পাঠযোগ্য করে তুলতে তাঁরা ইংরেজি বিরাম চিহ্ন কাজে লাগালেন। সেজন্য ইংরেজি নামই বিরাম চিহ্নের পরিচয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিরাম-চিহ্নে পরিচয়

নিচের একটি ছকে বিরাম-চিহ্নগুলোর পরিচয় দেয়া হল:

ক্রমিক	ব্যবহৃত নাম	বাংলা অর্থ	ইংরেজি নাম	আকার	বিরামের সময়
১	কমা	পাদচ্ছেদ	Comma	,	১ বলতে যে সময় প্রয়োজন
২	সেমিকোলন	অর্ধচ্ছেদ	Semicolon	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়
৩	দাঁড়ি	পূর্ণচ্ছেদ	Full Stop	।	১ সেকেন্ড
৪	প্রশ্নচিহ্ন	প্রশ্নবোধক চিহ্ন	Note of Interrogation	?	ঞ
৫	বিস্ময়চিহ্ন	বিস্ময়সূচক চিহ্ন	Note of Exclamation	!	ঞ

৬	কোলোন	ছেদ	Colon	:	ঞ
৭	কোলোন-ড্যাশ	ছেদ বাক্যসঙ্গতিচিহ্ন	Colon Dash	-	১ সেকেন্ড
৮	ড্যাশ	বাক্যসঙ্গতি চিহ্ন	Dash	-	ঞ
৯	হাইফেন	শব্দ সংযোগ	Hyphen	-	থামার প্রয়োজন নেই
১০	জোড়-উদ্বৃত্তি চিহ্ন।	জোড়-উদ্বৃত্তি চিহ্ন।	Inverted Commas	“ ”	১ বলতে যে সময় প্রয়োজন
১১	এক-উদ্বৃত্তি চিহ্ন	এক-উদ্বৃত্তি চিহ্ন	Quotation Marks	‘ ’	১ সেকেন্ড
১২	লোপ চিহ্ন	ইলেক চিহ্ন	Apostrophe	'	থামার প্রয়োজন নেই
১৩	প্রথম বন্ধনী চিহ্ন	প্রথম বন্ধনী চিহ্ন	First Brackets	()	ঞ
১৪	দ্বিতীয় বন্ধনী চিহ্ন	দ্বিতীয় বন্ধনী চিহ্ন	Second Brackets	{ }	ঞ
১৫	তৃতীয় বন্ধনী।	তৃতীয় বন্ধনী চিহ্ন	Third Brackets	[]	ঞ
১৬	বর্জন চিহ্ন	বর্জন চিহ্ন	slash	.. /	
১৭	বিন্দু চিহ্ন	বিন্দু	Dot	.	
১৮	বিকল্প চিহ্ন	বিকল্প চিহ্ন	Asterisk	/	

বিরাম-চিহ্নে ব্যবহার

কমা চিহ্ন (,)

বাংলায় কোনো কিছু লিখতে গিয়ে যত ধরনের যতিচিহ্ন আমরা ব্যবহার করি তার মধ্যে সবচেয়ে
বেশি ব্যবহৃত হয় কমা। বাক্যের ভিতরের বিরাম-চিহ্ন হল কমা। অর্থাৎ বাক্যেটি যদি বড়ো হয় তা
হলে দম নেওয়ার জন্যে থামার দরকার পড়তে পারে, বক্তব্য একাধিক হলে স্পষ্টতা আনার লক্ষে
থেমে-থেমে পড়তে হতে পারে, সর্বোপরি অল্পক্ষণ বিরামের জন্যে কমার ব্যবহার হয়। এখানে ‘এক
উচ্চারণ করার সমান সময় থামতে হয়। অল্প বিরাম বোঝাতে নিম্নলিখিত স্থানে কমা ব্যবহৃত হতে
পারে।

১. বাক্যে একই পদের একাধিক শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হলে তাদের মধ্যবর্তী একটি বা একাধিক
কমা ব্যবহার করে এক জাতীয় পদকে পৃথক করা হয়। কমা বসে দুই বা ততোধিক পদে। বিশেষ
পদ: সালাম, বরকত, রফিক, জবাব-এঁরা বাংলা ভাষার জন্যে শহীদ হয়েছেন।

সর্বনাম পদ: সে, তুমি, আমি অর্থাৎ আমরা তিনজন যাব।

ক্রিয়া পদ: এলাম, দেখলাম, জয় করলাম।

২. একই পদের বারবার ব্যবহারের মাঝে কমা বসে। যেমন- আমি কলেজ যাব, যাব, যাব।
৩. সম্মোধনের পর কমা বসে। যেমন- ছাত্ররা, মনোযোগ দিয়ে শোন।
৪. নামের শেষে ডিগ্রি থাকলে কমা বসে। যেমন- ডেস্ট্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম. এ., পিএইচ.ডি।
৫. উদ্বৃত্তিচ্ছের আগে কমা বসে। যেমন- আমি বললাম, “আমি ভাল আছি।”
৬. ভাবান্তরমূলক বাব্যাংশের পর কমা দিতে হয়। যেমন- আমার মনে হয়, সে আসবে।
৭. তারিখ লিখতে কমা বসে। যেমন- ১ লা বৈশাখ, ১৪২৫ সাল।

সেমিকোলন বা অর্ধচ্ছেদ হচ্ছে বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত এক ধরনের বাক্যান্তর্গত চিহ্ন। মনোভাব প্রকাশের বেলায় একটা ভাব একটিমাত্র বাক্যে শেষ হয়ে সম্মিলিত ভাবের নতুন বাক্য শুরু করতে চাইলে একটু বেশি থামতে হয়। অর্থাৎ একাধিক বাক্যের মধ্যে অর্থের নিকট-সম্বন্ধ থাকলে বাক্যগুলোরকে একটু বেশি থামার চিহ্ন দিয়ে ভাগ করতে হয়। এর জন্যে সেমিকোলন বসে।

সেমিকোলনের বিরামের অনুপাত কমার (,) দ্বিগুণ। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়।

১. একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখলে মাঝখানে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন- তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন; কোথাকার জল কোথায় গিয়া পড়ে।
২. কোনো তালিকায় একাধিক ব্যক্তির নাম ও তাদের পদের উল্লেখ থাকলে বোঝবার সুবিধার জন্যে সেমিকোলন ব্যবহার করা হয়। যেমন- এবারের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদে যারা রয়েছেন তাঁরা হলেন: আকবরউদ্দিন আহমেদ, সভাপতি; আফসার রায়হান, সাধারণ সম্পাদক; চিন্ত বড়ুয়া, প্রচার সম্পাদক; ইত্যাদি।

৩. যেসব বাক্যে ভাবসাদৃশ্য আছে তাদের মধ্যে সেমিকোলন বসে। যেমন- দিনটা ভাল নয়; মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে।

দাঁড়ি (।)

বাক্যে সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেলে দাঁড়ি বসে। বাক্যের সমাপ্তি এবং নতুন বাক্যের সূচনায় নির্দেশ করে দাঁড়ি। দীর্ঘতম বিরামের প্রতিরূপ হয় দাঁড়ি। যেখানে একটি পূর্ণবাক্য বা প্রসঙ্গ শেষ হয় সেখানে দাঁড়ি বসে।

প্রশ্নচিহ্ন (?)

১. বাক্যের মধ্যে সোজাসুজি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন- তোমার নাম কী?

২. সন্দেহ বোঝাতে বাক্যের মধ্যে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে। যেমন- এটা তোমার বই? ঠিক তো? বিশ্বায়চিহ্ন (!)

১. অবাক বা বিশ্বয়ের ব্যাপার বোঝাতে প্রধানত শেষে বসে। যেমন- অবাক কাও! ঠিক আধ মিনিট আগে পকেটে টাকা ছিল, এখন নেই।

২. আবেদন, ভর্তি, হতাশা, আনন্দ ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রেও বিস্ময়চিহ্ন বসে। যেমন- দয়া করে আমাকে বাঁচান! এই বিপদে আর কার কাছে যাব বলুন? আমার যাওয়ার যে কোনো জায়গা নেই।

উদ্ধৃতিচিহ্ন (অথবা “-*”)

ইংরেজিতে একে কোর্টেশন মার্ক বলে। ইংরেজি ভাষা থেকে এদের আমদানি করা হয়েছে, কারণ বাংলায় এ-ধরনের চিহ্ন ছিল না। একে উদ্ধৃতি বা উদ্বার চিহ্ন বলে। উদ্ধৃতিচিহ্নের শুরু ও শেষ আছে।

এক-উদ্ধৃতি ('') বা সিঙ্গেল কোর্ট

১. কথোপকথন ও সংলাপে উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

২. নির্দিষ্ট শব্দে মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন: তার ডাক নাম ছিল ‘লালু’।

৩. নির্দিষ্ট ভবনের নাম বা গ্রন্থের নাম জানানোর জন্যে উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

জোড়-উদ্ধৃতি (') বা ডাবল কোর্ট

যেখানে কেবল এক ধরনের উদ্ধৃতিচিহ্নেই প্রয়োজন সেখানে এক-উদ্ধৃতিচিহ্ন বা জোড়-উদ্ধৃতিচিহ্ন যে কোনো একটি ব্যবহার করলেই চলে।

১. এই “ভারতবর্ষ” কাগজেই অনেকে দিন পূর্বে নরেশবাবু বলিয়াছিলেন না জানিয়ে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ো না। কোলোন (:)।

বাংলায় কোলোন চিহ্নের ব্যবহার খুব বেশি দিনের নয়, বড়জোর পঞ্চাশ-ষাট বছরের। আগে যে-সব ক্ষেত্রে ড্যাশ বা কোলোনড্যাশ দেওয়া হত, আজকাল সে-সব জায়গায় কোলোন ব্যবহৃত হচ্ছে। লক্ষ করা দরকার, কোলো কথনোই দেখতে বিসর্গ (ঝ)-র মতো নয়; কোলোনের মাঝখানে কোনো ফাঁক থাকে না। নিম্নলিখিত স্থানে কোলোন ব্যবহৃত হয়।

১. বাকেয় কোনো প্রসঙ্গ অবতারণার আগে কোলোন বসে। যেমন- শপথ নিলাম: পাশ করবই। ২. উদাহরণ, তালিকা, ব্যাখ্যা, বিশদ মন্তব্যের আগে কোলন বসে। যেমন: বাড়িতে যে-সব জিনিস নিতে হবে : আম, চাল, ডাল, তেল ও দুই গজ সাদা সুতি কাপড়। কথায় আছে: অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। ৩. নাটকের চরিত্রের পরে ও সংলাপের আগে- রাজা: কে কোথায় আছ হাজির হও।

৪. কটা বেজে কত মিনিট তা সংখ্যায় নির্দেশ করতে: ৭:৩০; ১১:১০।

৫. ধারাবাহিক উপস্থাপনার কেলায়। যেমন- ছবিতে বাম থেকে : সফিক, শুভ, মোস্তফা।

৬. গণিতে অনুপাত বোঝাতে কোলোন বসে। যেমন- ৪ : ৮

ড্যাশ (-)

প্রথমেই ড্যাশ বা হাইফেন (-) চিহ্নের তফাতটা মনে রাখা জরুরি। হাইফেনের চেয়ে ড্যাশ বেশি লম্বা, দুটি হাইফেন পাশাপাশি জোড় লাগালে ড্যাশ হয়ে যায়।

নিম্নলিখিত স্থানে ড্যাশ ব্যবহৃত হয়:

১. বাক্য অসম্পূর্ণ থাকলে বাক্যের শেষে ড্যাশ বসে। যেমন : বাবা গজিয়া উঠিলেন, “বটে রে-
২. ইত্তত বা দ্বিধা প্রকাশে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন:আমি-আমি-পরীক্ষায় ভাল করি নি।
৩. উদাহরণ বা তালিকার আগে। যেমন : সবার জন্য চাই- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান।
৪. শূন্যস্থান পূরণের জায়গায় লুঙ্গ স্থানে ড্যাশ বসে। যেমন : আমাদের মাতৃভাষা।

হাইফেন (-)

হাইফেন যদিও ইংরেজি ভাষা থেকে এসেছে, তবু এর প্রয়োগ বাংলায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজিতে হাইফেন অত দরকার পড়ে না, বাংলায় যত পড়ে। বাংলা লেখার সময় বোঝা যায়, এর ভূমিকা খুবহো হাইফেন সব সময় বসে দুই বা ততোধিক শব্দের মধ্যে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে হাইফেন ব্যবহৃত হয় :

১. যে-সব ক্ষেত্রে সব কটি শব্দই সমান দরকারি এবং স্বাধীন, কেই কারো ওপর নির্ভরশীল নয়, সে-সব জায়গায় হাইফেন ব্যবহার করতে হবে। যেমন : সোনা-কুপা-মণি-মুক্তা কোনো কিছুতেই আমার লোভ নেই; আমি কেবল চাই একটু শান্তি।
২. একই শব্দ পরপর দু-বার বসলে তাদের মাঝখানে হাইফেন ব্যবহার করতে হবে। যেমন : হাঁটতে-হাঁটতে পায়ে ব্যথা ধরে গেল।
৩. পাশাপাশি অবস্থিত ভিন্নার্থক বা বিপরীত শব্দের সংযোগে দেখাতে। যেমন : আসা-যাওয়া, হিন্দু-মুসলমান।
৪. সংখ্যা বা পরিমাণগত ব্যবধান বোঝাতে। যেমন : আবহানী ২-৪ সেটে মোহামেডানের কাছে হেরেছে।

উৎর্ধৰকমা বা লোপ-চিহ্ন ()

উকমার ব্যবহার ইদানিং খুবই কমে গেছে। সাধারণত শব্দের একটি অংশ, বর্ণ বা অক্ষর বাদ দেওয়া হয়েছে বোঝাতে লোপ-চিহ্ন ব্যবহৃত হতো। যেমন : হইতে ১ হ'তে ইত্যাদি।

প্রথম বন্ধনী ()

১. ব্যাখ্যা করে বোঝানোর জন্য প্রথম বন্ধনী চিহ্ন বসে। যেমন : (বিরক্ত সূরে) কী সব বলছ? এক বিন্দু (.) : একবিন্দু বা ফুটকি চিহ্ন যতিচিহ্ন হিসেবে পূর্বে কখনো প্রযুক্ত হত না। বর্তমানে এই চিহ্নকে সংক্ষেপণের চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করা হয়; অবিকল ইংরেজিতে যেভাবে প্রয়োগ করা হয় বাংলাতেও সেভাবেই প্রয়োগ করা হয়। M.A = এম. এ বিন্দু (..): কথা অসমাঞ্চ রেখে দেওয়া হচ্ছে এমন বোঝাতে ত্রিবিন্দু ব্যবহার করা হয়। যেমন : পাগল আমিই, নাকি অন্যরা-যারা...।

বিকল্পচিহ্ন (/) : বিকল্পচিহ্ন প্রয়োগ করে বোঝানো হয়- দুই বা ততোধিক শব্দ বা বাক্যের মধ্যে যে কোনোটি হতে পারে। যেমন:

১. ঘরের মধ্যে বেশি লোক নেই তো বড়ো জোর আট/দশ জন হবে।
২. বাড়ির নম্বৰ নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। যেমন- ২৭/১২ মীর মশাররফ হোসেন সড়ক, কুষ্টিয়া।

ধ্বনি পরিবর্তন বলতে কী বোঝা? ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ ও সূত্রাবলি আলোচনা কর।

ভাষার পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। উচ্চারণের সময় সহজীকরণের প্রবণতায় সন্দের মূল ধ্বনির যেসব পরিবর্তন ঘটে তাকে ধ্বনি পরিবর্তন বলা হয়। ধ্বনির পরিবর্তন নানা প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। সাধারণত জিভের আলসেমি, অনুধাবন ও অনিছাকৃত ক্রটি, সহজে উচ্চারণ করার প্রবণতা ইত্যাদি কারণে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। এরা ফলে উচ্চারণের সময় এক ধ্বনির জাগরায় অন্য ধ্বনি আসে, পরের ধ্বনিকে আগেই উচ্চারণ করা হয়।

ভাষার বহিরঙ্গ গঠনের মূল উপাদান হল ভাষার ধ্বনি এবং তার অন্তরদ্বয় বক্তব্য হল তার অর্থ। ভাষার পরিবর্তনের তাই দু'টি প্রধান দিক হল ধ্বনি পরিবর্তন (Sound Change) এবং অর্থ পরিবর্তন (Sematic Change)।

ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ। কতগুলো কারণে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। সেগুলি নিচে আলাচেচনা করা হল:

ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু: বিখ্যাত দার্শনিক বডিন প্রথম অনুমানি করেন যে, একটি জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি সেই জাতির ভৌগোলিক পরিবেশ ও তার জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই থেকে কোনো-কোনো ভাষাতত্ত্ববিদ সিদ্ধান্ত করেন যেখানকার ভূপ্রকৃতি রূক্ষ কঠোর স্থান কার ভাষায় কর্কশতা ও কঠোরতা বেশী এবং যেখানকার ভূপ্রকৃতি বর্ষাসিঞ্চ কোমল স্থানকার ভাষায় কোমলতা ও মাধুর্য বেশী। এই কারণে জার্মানি ও ইংরেজি ভাষা অপেক্ষাকৃত কর্কশ, আর ফরাসি ও ইতালিয় ভাষা অপেক্ষাকৃত মধুর। এই কারণে পঞ্চম চার্লাসের বিখ্যাত উক্তি, "তুমি ভগবানের সাথে কথা বলি স্পেনীয় ভাষায়, নারীর সঙ্গে কথা বলি ইতালীর ভাষায়, পুরুষের সঙ্গে কথা বলি ফরাসী ভাষায় এবং আমার ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলি জার্মান ভাষায়"- এর পেছনে কেই কেই ভৌগোলিক কারণ আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেক ভাষায় স্বরূপ স্বাতন্ত্র্য যে পুরোপুরি ভৌগোলিক প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একথা সর্বক্ষেত্রে অব্যর্থবাবে লক্ষ্য করা যায় না। বর্ষাসিঞ্চ সুজলা সুফল! বঙ্গপ্রকৃতির কোলে গড়ে উঠা বাংলা ভাষা একটি মধুর ভাষা সন্দেহ নেই, কিন্তু দিল্লি-আলীগড়-লক্ষ্মী অঞ্চলের শুক্র রূক্ষ প্রকৃতিতে বিকশিত উর্দু ভাষার মাধুর্যও সর্বজনস্মীকৃত।

অন্যজাতির ভাষার প্রভাব: একটি জাতি দীর্ঘকাল অন্যজাতির শাসনাধীনে থাকলে শাসকজাতির ভাষার প্রভাব শাসিত জাতির ভাষায় পড়তে থাকে। এর ফলে এক ভাষার শব্দ ও বাগধারাই শুরু অন্য ভাষায় গৃহীত হয় তা নয়, একভাষার উচ্চারণরীতি এবং ধ্বনিও অন্য ভাষায় গৃহীত হয়, এবং এতে গ্রহণকারী ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

উচ্চারণের ক্রটি, আরামপ্রিয়তা: ভাষা ব্যবহারে দুটি টক্ষের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বক্তা ও শ্রোতা। বক্তা ভাষা উচ্চারণ করে এবং শ্রোতা তা শ্ববণ করে। বক্তার উচ্চারণে বা শ্রোতার শ্ববণে ক্রটি ঘটলে ধ্বনিবিকৃতি সাধিত হয় এবং সেই ধ্বনিবিকৃতিই প্রচলিত লাভ করলে ভাষার ধ্বনির পরিবর্তন সাধিত হয়। বক্তার দিক থেকে যদি ধ্বনি উচ্চারণের কষ্ট লঘব করার প্রবণতা থাকে অথবা জিহ্বার আড়ষ্টতা থাকে তা হলে বক্তা অনেক দুরচার্য ধ্বনিসমাবেশকে সহজ করে ফেলে।

শ্রবণের ও বোধের ক্ষতি: বক্তার দিক থেকে উচ্চারণের ক্ষতির ফলে যেমন ধ্বনিবিকৃতি হতে পারে ,
শ্রোতার দিক থেকে শোনার ও বোঝার ক্ষতির ফলেও তেমনি ধ্বনিবিকৃতি ঘটতে পারে। বিদেশি ভাষা
থেকে গৃহীত শব্দের ধ্বনিবিকৃতি ও ধ্বনিপরিবর্তন এই কারণে হতে পারে ।।

ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা ও সূত্র

আদি অব্রাগম: সাধারণত শব্দের আদিতে সংযুক্ত ব্যঙ্গন থাকলে সেই সংযুক্ত ব্যঙ্গনের উচ্চারণ
সৌকর্যের জন্মে আগে একটা অব্রাগনি এনে ফেলা হয়। শব্দের আদিতে অব্রাগনির এই আবির্ভাবকে
বলে আদি অব্রাগম । যেমন: কুল > ইকুল, স্পৃহা > আম্পৃহা

মধ্যস্থরাগম/অব্রভক্তি: উচ্চারণের সুবিধার জন্য যুক্ত অক্ষরের মধ্যে আমরা অব্রাগনি এনে ফেলি ।
ধ্বনি পরিবর্তনের এক ধারাকে মধ্যস্থরাগম বলে।

যুক্তব্যঙ্গন উচ্চারণে বাগ্যঝোর ওপর বাড়তি চাপ পড়ে। সেজন্য বাল্লা ভাষার সম্ভাব্য ক্ষেত্রে
যুক্তব্যঙ্গনকে ভেঙ্গে তার। মাঝে অব্রাগনি এনে উচ্চারণকে সহজ ও সরল করার প্রবণতা দেখা যায়।
ভক্তি শব্দের অর্থ বিভাজন। অব্রভক্তি শব্দের অর্থ অব্র সহযোগে বিভাজন। যেমন: গ্রাস > গেরাস।
ভক্তি > ভক্তি গ্লাস > গেলাস।

অন্ত্যস্থরাগম: কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত অব্রাগনি আসে। এজন অব্রাগমকে বলা হয়
অন্ত্যস্থরাগম । যেমন: দিশ > দিশা

সত্তা > সত্তি

অপিনিহিতি: শব্দের মধ্যে ব্যঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত 'ই' বা 'উ' উচ্চারণের সময় অব্রাগনে উচ্চারিত না হয়ে
যে ব্যঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত তার অব্যবহিত পূর্বে উচ্চারিত হলে ওই বীতিকে অপিনিহিতি বলে । যেমন:
আজি > আইজি

সাধু > সাউধু । সত্তা > সইত্তা।

অভিশ্রূতি: অভিশ্রূতি অপিনিহিতির পরবর্তী পর্যায় । কথা বা চলিত বাল্লায় অপিনিহিতি ও অভিশ্রূতি
জনিত কারণে ধ্বনি পরিবর্তনের অনেক নির্দশন আছে। অপিনিহিতির 'ই' বা 'উ' পরবর্তী অব্রাগনির
সঙ্গে এক প্রকার সঞ্চিতে মিলিতে হলে এবং তার প্রভাবে পরবর্তী হয়ের সঙ্গতি বা বিকৃতি ঘটলে
তাকে বলা হয় অভিশ্রূতি! যেমন: রাখিয়া > রাইখা (অপিনিহিতি) > রেখে (অভিশ্রূতি)। | মাইখ্যা >
মেখে (অপিনিহিতি) > মেখে (অভিশ্রূতি)।

সমীক্ষণ বা সমীকরণ: শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অব্যহিত অসম ব্যঙ্গনধ্বনি উচ্চারণের সুবিধার্থে একে
অপরের প্রভাবে সঞ্চতি বা সাম্য লাভ করলে, তাকে বলা হয় সমীক্ষণ বা সমীকরণ। যেমন: জন্য >
জন্ম, কাঁদনা > কামা।

সমীক্ষণ তিন বীতিতে হয়। যথা ক. প্রগত সমীক্ষণ।

ক. প্রগত সমীক্ষণ গ. অন্যোন্য সমীক্ষণ

ক. প্রগত সমীক্ষণ: পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী অসম ব্যঙ্গনধ্বনি পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনধ্বনির

ক. প্রগত সমীক্ষণ: পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী অসম ব্যঙ্গনধ্বনি পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনধ্বনির

সমতা প্রাপ্ত হয় তাকে প্রগত সমীক্ষণ বলে। যেমন: গলনা > গল্লা, পন্থ > পন্থ, শৰ্প > সংয়।

খ. পরাগত সমীভবন: পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী অসম ব্যঞ্জনধ্বনি পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সমতা লাভ করে। তাকে পরাগত সমীভবন বলে। যেমন: কর্ম > কম্ব, কর্তা > কত্ত।
গ. অন্যোন্য সমীভবন: পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অসম ব্যঞ্জনধ্বনির পরস্পরকে প্রভাবিত করে উভয়ে রূপান্তরিত হয়ে সাম্য লাভ করে তাকে অন্যোন্য সমীভবণ বলে ।। যেমন: বিশ্বি > বিছিরি, কুৎসিত > কুচ্ছিত

বিষমীভবন: সমীভবনের বিপরীত রীতি বিষমীভবন। শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত সমান দুই ব্যঞ্জনের মধ্যে যেকোন একটি বদলে গেলে, ধ্বনি পরিবর্তনের এই রীতিকে বলা হয় বিষমীভবন ।।

যেমন: শরীর > শরীল, লাল > নাল, লেবু > নেবু।

ধ্বনি বিপর্যয়: উচ্চারণের সময় কিছু কিছু শব্দস্থিত ধ্বনির স্থান পরিবর্তন ঘটে। আগের ধ্বনি পরে যায় ও পরের ধ্বনি আগে আসে- এরকম অবস্থানগত বিপর্যয়কে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন: পিশাচ > পিচাশ, মগজ > মজগ, লাফ > ফাল

নাসিকীভবন: নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ঙ, ংং, এও, ণ, ন, ম লোপ পাওয়ার ফলে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সানুনাসিক হলে, পরিবর্তন জনিত এই প্রক্রিয়ার নাম নাসিকীভবন। যেমন: হংস > হাঁস, ভণ > ভাড়, কম্প > কাপা, তাম্ব > তবু

সম্প্রকর্ষ বা ধ্বনিলাপে: শব্দের অন্তগর্ত একটি ধ্বনি বা একাধিত ধ্বনি বাদ দিয়ে আমরা কোনাঠে শব্দকে একটু ছোট করে আনি, এতে উচ্চারণের সুবিধাও হয়। অর্থাৎ দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লাগেপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ বা ধ্বনিলাপে ।। যেমন: বসতি > বসৃতি, জানলা > জানলি

বর্ণন্বিত: অর্থের গুরুত্ব অনুযায়ী কিছু শব্দের কোনো ধ্বনির উচ্চারণে দ্বিতীয় হয়, আর সে কারণে তাদের বানানে দ্বিতীয় আসে। যেমন: সকাল > সক্কাল, বড় > বড়ড়, ছোট > ছোট্ট, পাকা > পাক্কা

ধ্বনিবিকার: পদের অন্তগর্ত কোনো বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করলে তাকে ধ্বনিবিকার বলে। যেমন: শাক > শাগ, ধোবা > ধোপা।

ব্যঞ্জনচূড়ি বা ধ্বনিচূড়ি: পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়, আর এই রূপ লোপকে বলা হয় ব্যঞ্জনচূড়ি। যেমন: বড়দিদি > বড়দি, বড়দাদা > বড়দা

শ্রতিধ্বনি: পাশাপাশি দুটি কিংবা তার বেশি স্বরধ্বনি থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য তাদের মধ্যে একটি জ ধ্বনি এলে তাকে শ্রতিধ্বনি বলে।। যেমন: চা + র (এর) = চায়ের, মা + র(এর) = মায়ের

লোকনিরঙ্গি: অপরিচিত শব্দ লোকমুখে পরিচিত শব্দের সাদৃশ্য পেয়ে যে পরিবর্তন ঘটে তাকে লোকনিরঙ্গি বলে যেমন: উর্ণাত > উর্ণনাত

ফলে

বিমুখ ধ্বনিপরিবর্তন: একই শব্দ যদি ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে একাধিক রূপ লাভ করে অর্থাৎ ধ্বনির পরিবর্তনের সময় যদি একই শব্দ থেকে একাধিক শব্দের জন্ম হয় তবে সেই ধরনের পরিবর্তনের বিমুখ ধ্বনিপরিবর্তন বলে। যেমন: ভণ > ভান ও ভাঁড়, চিত্র > চিতা ও চিত্তির